بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯শে জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা গুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন কিন্তু তাঁর পবিত্র শক্তির মাধ্যমেই তাঁকে চেনা যায়। দোয়ার মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেউ রাজা বা রাজাধিরাজ আখ্যায়িত হলেও কোন না কোন সময় সে অবশ্যই সমস্যার সম্মুখীন হয় আর এমন ক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণরূপে দিশেহার ও অসহায় হয়ে পড়ে এবং বুঝে উঠতে পারে না, এখন কি করা উচিত, তখন দোয়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বহু জায়গায় বিভিন্ন ভাবে এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে এর গুরুত্ব স্পষ্ট করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীগণ এই বিষয়ের এতটা বুৎপত্তি এবং জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের কল্যাণে দোয়ার প্রতি তাদের এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও এমন ঈমান ছিল যে, অ-আহমদীদের ওপরও এর সুগভীর প্রভাব ছিল। ভিন ধর্মী হলেও আহমদীদের সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল তারা বুঝতো, এদের দোয়া গৃহীত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সন্নিধানে একটি ঘটনা শোনানো হয় যা শুনে তিনি প্রাণ খুলে হেসে উঠেন। এটি হযরত মুন্সী আরুঢ়া খান সাহেবের ঘটনা। হযরত মুন্সী সাহেব প্রথম দিকে ঘন-ঘন কাদিয়ান আসতেন বা তার অনেক বেশি যাতায়াত ছিল। পরে যেহেতু তার ওপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল তাই তিনি খুব একটা ছুটি পেতেন না বা ছুটি পাওয়া কঠিন ছিল কিন্তু তারপরও প্রায় সময়ই তিনি কাদিয়ান আসতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের মনে আছে যখন আমরা ছোট বালক ছিলাম তখন তার আগমন এমনই মনে হতো যেভাবে দীর্ঘ দিনের বিচ্ছিন্ন কোন ভাই বছরান্তে এসে তার কোন স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করছে। যদিও তিনি ঘন ঘন আসতেন তবুও তার সাথে এমন আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সাক্ষাৎ হতো যেন বহু বছর পর দেখা হচ্ছে বা সাক্ষাৎ হচ্ছে। ঘটনা বর্ণনাকারী যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে এই ঘটনা বর্ণনা করছেন তিনি বলেন, মুন্সী আরুঢা খান সাহেব এমন মানুষ যিনি ম্যাজিস্ট্রেটকেও ভীত এবং ত্রস্ত রাখেন। তিনি শোনান, একবার তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন, আমি কাদিয়ান যেতে চাই, আমাকে ছুটি দিন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ছুটি দিতে অস্বীকার করেন। সে সময় হযরত মুন্সী সাহেব সেশন জজের অফিসে কর্মরত ছিলেন। তিনি বলেন, কাদিয়ান আমি অবশ্যই যাব, আপনি আমাকে ছুটি দিন। ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, এখন কাজ অনেক তাই আপনাকে ছুটি দেয়া সম্ভব নয়। মুন্সী সাহেব বলেন, ঠিক আছে

আপনার কাজ হোক, আপনি বলছেন অনেক কাজ আছে, কাজ করান, আমাকে ছুটি না দেন কিন্তু আজ থেকে আমি অভিশাপ দেয়া আরম্ভ করবো, আপনি যেই কাজের কথা বলছেন আপনার সেই কাজ যেন কখনও সমাধা না হয়। আপনি যদি যেতে দিতে না চান না দিন। অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেটের এমন কোন ক্ষতি হয়ে যায় যার ফলে তিনি চরমভাবে ভয় পেয়ে যান। এরপর সেই ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর যে প্রভাব পড়ে তাহলো, শনিবার আসলেই ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অন্যান্য কর্মচারীদের বলতেন, আজকে তাড়াতাড়ি কাজ গুটিয়ে নিও কেননা; তা না হলে মুন্সী আরুঢা খান সাহেবের গাড়ির সময় পেরিয়ে যাবে। যেই ট্রেনে তার কাদিয়ান যাওয়ার কথা সেই ট্রেন চলে যাবে, তাই তাড়াতাড়ি কাজ গুছিয়ে নিও। এভাবে যখনই মুন্সী সাহেবের কাদিয়ান আসার ইচ্ছা হতো ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ছুটি দিয়ে দিতেন। অতএব তার দোয়ার ফলশ্রুতিতে তিনি এভাবেই ভীত-ত্রস্ত ছিলেন। অতএব এই এসব মানুষরাই নিজেদের পুণ্য এবং দোয়ার মাধ্যমে অন্যদেরও প্রভাবিত করে রেখেছিলেন আর আজও এমন বিষয়ই আমাদের সামনে রাখা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে আমি আরও কিছু কথা শোনাতে চাই যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন এবং আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও তরবীয়তের জন্য যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন অনুভূতির মানুষ থেকে থাকে। অনেকেরই অনুভূতি প্রখর হয়ে থাকে আবার অনেকের দুর্বল। অনেকেই বিশেষ পরিস্থিতির ফলে কোন আবহাওয়ায় বা পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে যায় আর অনেকের জন্য সেই অবস্থায় জীবন যাপন করা কঠিন হয়ে থাকে। এক কথায় অভ্যাস না থাকার কারণে তারা সংবেদনশীল হয়ে থাকে বা তাদের স্বভাব অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয় । অতএব শীত, গ্রীষ্ম, সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধের যে অনুভূতি সেটি এই অনুভব শক্তি বেশি বা কম হওয়ার সাথে ওপর নির্ভর কওে যা মানুষের এসব অনুভূতি শক্তির পার্থক্যকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকাংশ মানুষই স্পর্শকাতর বা সংবেদনশীল হয়ে থাকে। শীত এবং গরমের অনুভূতি আর সুগন্ধ-দুর্গন্ধের অনুভূতি এবং অন্যান্য অনুভূতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যাদের অনুভব শক্তি নেই তারা একথা প্রমাণ করতে পারে না যে, এসব জিনিসের কোন প্রভাব নেই বা এমন জিনিসের অস্তিত্বই নেই। যারা বরফবহুল অঞ্চলে বসবাস করে বা যাদের শীত কম লাগে অর্থাৎ কিছু মানুষ এমনও হয় যারা শীতকালেও, যেখানে মানুষের পা ঠান্ডায় কাঁপে, মোটা মোজা পায়ে দিয়ে রাখে সেখানে অনেকেই আবার মোজা ছাড়াই চলাফেরা করে আর বলে, পায়ে খুব গরম লাগে। অন্যান্য অনুভূতি বা অনুভব শক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রজোয্য। কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, সেখানে শীত নেই বা শীতের কোন প্রভাব নেই। অধিকাংশ মানুষই স্পর্শকাতর বা সেন্সেটিভ হয়ে থাকে।

অতএব এসব জিনিসের প্রভাব অবশ্যই রয়েছে আর অধিকাংশ মানুষের ওপরই এর প্রভাব পড়ে যারফলে মানুষের মাঝে এটি প্রকাশও পেয়ে যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে এই অনুভূতি শক্তির পার্থক্যের একটি জাগতিক দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, কোন শহরে কয়েকজন নাগরিক আলোচনা করছিল যে তিল খুবই গরম হয়ে থাকে, কেউ এক বা আড়াইশ' গ্রাম তিল খেতে পারবে না, খেলে তখনই অসুস্থ হয়ে পড়বে। অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এমনই হবে। হতেই পারে না যে, কোন ব্যক্তি এক পোয়া তিল খাবে অথচ অসুস্থ হবে না। এই আলোচনা চলাকালেই একজন বলে, যদি কেউ এ পরিমান তিল খেতে পারে তাহলে আমি তাকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব। কোন এক জমিদার (বা কৃষক) সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের কাঁচা জিনিস খাওয়ার অভ্যাস থাকে আবার পরিমাণেও বেশি খাওয়ারও অভ্যাস হয় কেননা তারা পরিশ্রমও করে বা কিছু প্রকৃতির মানুষ এমন হয়ে থাকে। সেই জমিদারও বড় নাছোড় প্রকৃতির ছিল বা শক্ত প্রকৃতির ছিল, সে বিস্মিত হয় এবং অবাক হয়ে তাদের কথা শুনতে থাকে। সে ভাবছিল, অদ্ভুত ব্যাপার, এমন মজার জিনিস খেলে পাঁচ রুপি পুরস্কারও পাওয়া যায়! তিলও খাবে আবার পাঁচ রুপি পুরস্কারও পাবে। সে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, ডাল সহ খেতে হবে নাকি ডাল ছাড়া। এটি জিজ্ঞেস করার কারণ হলো, তার বোধগম্য হচ্ছিল না যে, ডাল ছাড়া তিল খেলে পাঁচ রুপি পুরস্কার কীভাবে পেতে পারে? সে ডাল সহ খাওয়ার জন্যও প্রস্তুত ছিল অথচ যারা কথা বলছিল তারা এই পরিমাণ তিল খাওয়া অসম্ভব মনে করছিল। দেখ! এই উভয় শ্রেণীর অনুভূতির মাঝে কত বড় পার্থক্য। একটি শ্রেণী এমন যারা এক পোয়া তিল খাওয়াকেও অসম্ভব মনে করছিল আর একজন ভাবছিল, শাখা বা ডাল ছাড়া খাওয়া তো খুবই সামান্য ব্যাপার, এরফলে কীভাবে পাঁচ রুপি পুরস্কার পাওয়া সম্ভব হতে পারে?

অতএব পৃথিবীতে পার্থক্য শুধু অনুভূতিরই। আর আধ্যাত্মিক জগতেও আমরা একই বিষয় দেখতে পাই। কারও ওপর নামাযের প্রভাব বেশি পড়ে আবার কারও ওপর কম। অনেকেই এমন আছে যারা কেবল বাহ্যতঃ নামায পড়ে বা মুরগির আধার খাওয়ার অর্থাৎ ঠোকর মারার মতো নামায এবং পড়ে চলে যায়। নামাযের কোন প্রভাব তাদের ওপর পড়ে না। আধ্যাত্মিক অনুভূতি যে রয়েছে এর প্রমাণ হিসেবে তাদের স্বাক্ষ্যই গৃহীত হবে যাদের মাঝে এই অনুভূতি প্রখর বা যাদের ওপর এর প্রভাব বেশি পড়ে, যারা ইবাদত করে এবং তাদের ওপর এই ইবাদতের কার্যকারিতাও দেখা যায়

অতএব জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর এরূপই হওয়া উচিত যাদের অনুভূতি এমনই যারা আধ্যাত্মিক প্রভাব বেশি গ্রহণ করবে আর এরপর পৃথিবীবাসীকে অবহিত করবে যে, প্রকৃত নামায কী আর সত্যিকার ইবাদত কী এবং এর জন্য কেমন অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)ও শোনাতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটিকে অপর এক বরাতে বর্ণনা করেছেন কিন্তু এই ঘটনা থেকে একথাও বোঝা যায় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যখন নেক প্রকৃতির বড় বড় জ্ঞানী আলেমরা আসতেন তখন তারা তাঁর হাতে বয়আতও করতেন বা বয়আতের সৌভাগ্যও লাভ করতেন।

হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, একজন ধর্মীয় আলেম ছিলেন যিনি অনেক বড় একজন আরবী ব্যাকারণবিদ ছিলেন এবং গোটা ভারতে তার জ্ঞানের সুখ্যাতি ছিল। তিনি এতটা সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন যে তাকে যারা চিনতো না তারা তাকে দেখলে মনে করতো, তিনি ঘাস কেটে আসছেন, কোন সাধারণ শ্রমজীবি মানুষ হবেন। তার নাম ছিল মৌলভী খান মালেক সাহেব। তিনি কারও কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি সম্পর্কে শুনে কাদিয়ান আসেন এবং তাঁর (আ.) কথাবার্তা শুনে ঈমান আনেন। ফেরার পথে তিনি যখন লাহোর পৌঁছেন তখন তিনি মৌলভী গোলাম আহমদের সাথে সাক্ষাতের সংকল্প করেন। মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেব শাহী মসজিদে দরস দিতেন এবং তিনি মৌলভী খান মালেক সাহেবের শিষ্য ছিলেন। মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেবও অনেক বড় প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন আর লাহোরের মানুষ যেহেতু সম্পদশালী ছিল তাই মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেবের আর্থিক অবস্থাও ছিল স্বচ্ছল । শত শত ছাত্র তার কাছ থেকে পাঠ নিতো। মৌলভী খান মালেক সাহেব যখন শাহী মসজিদে পৌঁছেন, ছাত্ররা যেহেতু জানতো না যে, ইনি কোন মাপের আলেম তাই তারা তার সাধারণ বেশ-ভূষা এবং বাহ্যিক চেহারা সুরত দেখে মনে করে যে, ইনি সাধারণ কোন মানুষ। মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেব মৌলভী খান মালেক সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, কোত্থেকে এলেন? তিনি বলেন, কাদিয়ান থেকে আসছি। সেই ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কাদিয়ান থেকে? ইনি বলেন, হ্যাঁ কাদিয়ান থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কেন? ইনি বলেন, মির্যা সাহেবের শিষ্যত্ব বরণ করতে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, আপনি এত বড় আলেম, তাঁর মাঝে কী এমন বৈশিষ্ট্য দেখলেন যে, তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করতে গিয়েছেন? মৌলভী খান মালেক সাহেব তখন পাঞ্জাবীতে বলেন, তুমি নিজের চরকায় তেল দাও। তুমি তো ক্বালা ইয়াক্বূলুও অর্থাৎ আরবীর সাধারণ ব্যাকরণও জানো না মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেবও যেহেতু অনেক প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন তাই মৌলভী খান মালেক সাহেব যখন একথা বলেন তখন মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেবের ছাত্ররা মারাত্মকভাবে ক্ষেপে যায়। তারা মৌলভী খান মালেক সাহেবকে সম্বোধন করে বলে, এই বুড়ো! তুমি এটি কি বললে? মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেব তখন ছাত্রদের বারণ করেন আর বলেন, ইনি যা বলছেন সত্য বলছেন।

অতএব এমন পুণ্য প্রকৃতির মানুষও ছিলেন যারা কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আসতেন, জ্ঞানের কোন গরীমাই তাদের ছিল না।

একইভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে একজন আরব আসেন। এদের যেহেতু সচরাচর হাত পাতার অভ্যাস থাকে তাই কিছুদিন পর তিনি যখন এখান থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পথখরচ হিসেবে তাকে কিছু অর্থ দেন কিন্তু সে তা নিতে অস্বীকার করে এবং বলে, আমি শুনেছিলাম আপনি মা'মূর বা প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন তাই এখানে এসেছিলাম, কিছু নিতে আসিনি। এটি

অস্বাভাবিক বিষয় ছিল। এই এলাকায় হয়ত কোন মানুষ এমন আসেনি যে হাত পাততো না অর্থাৎ সে যুগে মানুষ এখানে এসে এমনটিই করতো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি দেখে বলেন, আপনি আরও কিছু দিন এখানে অবস্থান করুন। সেই ব্যক্তি তখন আরও কিছু দিন সেখানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি (আ.) তাকে তবলীগ করার জন্য কয়েকজনকে নিযুক্ত করেন। বেশ কিছুদিন তার সাথে আলোচনা হয় কিন্তু তার ওপর এর কোন প্রভাব পড়েনি। অবশেষে যারা তবলীগ করছিলেন তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন, এই ব্যক্তি খুবই আবেগপ্রবণ, যারা হাত পাতে তাদের মতো নয়। এই ব্যক্তি সত্যের সন্ধানে আছে বলে মনে হয়, যেমনটি আমরা আজকাল যেসব আরব আহমদী হচ্ছে তাদের মাঝে এই অনুসন্ধিৎসা দেখতে পাই। তারা হুযূর (আ.)-কে অনুরোধ করেন, তারা হুযূর (আ.)-কে তার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করেন, কেননা তবলীগ ফলপ্রসূ হচ্ছিল না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়া করেন এবং তাঁকে অবহিত করা হয় যে, এ ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করবেন অর্থাৎ সত্য গ্রহণ করবেন। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র মহিমা দেখুন! সেই রাতেই কোন কথায় তার ওপর এমন প্রভাব পড়ে যে, সকালে উঠেই তিনি বয়আত করেন এবং ফিরে যান। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে হজ্জের সময়, তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি দলকে তবলীগ করেন। একটি কাফেলা বা দল তাকে মারতে মারতে বেহুশ বা অচেতন করে ফেলতো কিন্তু চেতনা ফিরে আসলেই তিনি দ্বিতীয় কাফেলা বা দলের কাছে গিয়ে তবলীগ আরম্ভ করতেন। কাজেই আসল কথা হলো, খোদা তা'লা যখন বক্ষ উম্মোচন করেন তখনই তা উন্মোচিত হয় আর মানুষের হৃদয়ে এমন অনুকরণীয় প্রেরণা সৃষ্টি হয় যে, তখন মানুষ কোন কিছুর প্রতিই আর ভ্রুক্ষেপ করে না।

অনুরূপভাবে তিনি আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে আমেরিকায় সর্বপ্রথম একজন ইংরেজ বা একজন আমেরিকান ইসলাম গ্রহণ করেন। তার নাম ছিল আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েব। ফিলিপাইনের আমেরিকান দূতাবাসে তিনি কাজ করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইংরেজী বিজ্ঞাপন যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচারিত হয় তখনই তার হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা জাগে এবং তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে পত্রালাপ আরম্ভ করেন। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেন। পরে তিনি ভারতেও আসেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের বাসনা ব্যক্ত করেন, তিনি লাহোর বা অন্য কোন বড় শহরে এসেছিলেন, সেখানকার মৌলভীদের সাথে যখন সাক্ষাৎ করেন তখন তারা তাকে বলে, মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলে মুসলমানরা তোমাকে আর চাঁদা দিবে না। তবলীগ করতে চাও, ইসলাম প্রচার করতে চাও, তবলীগের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছো ভালো কথা কিন্তু এর জন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতাই পাবে না। তাদের এই বিভ্রান্তির ফলে সেই ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেনি। অবশেষে চরম নৈরাশ্য নিয়ে সে এখান থেকে ফিরে যায় এমনকি

মুসলমানরাও তাকে কোনরূপ সাহায্য করেনি। তাকে বলা হয়েছিল, অন্যান্য মুসলমানরা তোমাকে সাহায্য করবে আর ইসলাম প্রচারের জন্য অনেক চাঁদা দিবে কিন্তু অন্যান্য মুসলমানরা তাকে কোন সাহায্যই করেনি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী সময়ে সেই ব্যক্তি মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পত্র লিখে এবং বলেন, আপনার উপদেশ না মেনে আমি জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, আপনি আমাকে বলেছিলেন মুসলমানদের মাঝে ধর্মসেবার কোন আগ্রহ নেই কিন্তু সেকথা আমি গ্রহণ করিনি। এর ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তাহলো, আপনার সাক্ষাৎ থেকে আমি বঞ্চিত থেকে গেলাম।

যাহোক সেই ব্যক্তি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মুসলমান ছিলেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তার নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। অতএব আমেরিকায় সর্বপ্রথম ইনিই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এখনও আমি দেখি, ইউরোপিয়ান দেশ সমূহের তুলনায় আমেরিকায় জামাতের উন্নতি বেশি হচ্ছে। যদিও কোন কোন ইউরোপীয়ান দেশেও আহমদীয়াতের বিস্তার ঘটছে আর ইউরোপও পাশ্চাত্যেরই অন্তর্গত কিন্তু আমেরিকায় উন্নতির লক্ষণাবলি বেশি দেখা যায়।

আমেরিকার জামাত এমন পুণ্যস্বভাবী লোকদের সন্ধান করবে এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করার চেষ্টা করবে আর এর জন্য বস্তুনিষ্ঠ এবং গঠনমূলক চেষ্টা করবে ;এটিই আমার আল্লাহর কাছে দোয়া থাকবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তা যেন বাস্তবে রূপ নেয়। একসময় আমেরিকায় অনেক মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং দৃঢ়তার সাথে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু তাদের অনেকেই এমন ছিলেন যাদের পরবর্তী প্রজন্ম বস্তুবাদিতার কারণে বা যোগাযোগের অভাবে অথবা অন্য কোন কারণে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। তাই এই উদ্দেশ্যেও জামাতের চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সন্তানদের সাথে কেমন সম্পর্ক রাখতেন, কীভাবে তাদের তরবীয়তের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সঠিক তরবীয়ত বা শিক্ষার রীতি সেটি যা খেলাধূলার মাধ্যমে তারা শিখে। অর্থাৎ প্রথমে বয়স যখন খুবই কম থাকে বা ছোট হয় তখন কাহিনী বা গল্প শুনিয়ে তাদের তরবীয়ত করতে হয়। বড়দের জন্য বা বয়স্কদের জন্য শুধু ওয়াজ নসীহত যথেষ্ট হলেও শৈশবে আগ্রহ ধরে রাখার জন্য কাহিনী বা গল্প শোনাতে হয়। কাহিনী মিথ্যা হওয়া আবশ্যক নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও আমাদের গল্প শোনাতেন। কখনও তিনি হযরত ইউসুফের কাহিনী বর্ণনা করতেন, কখনও বা হযরত নূহের গল্প শোনাতেন আবার কোন সময় হযরত মূসার ঘটনা বর্ণনা করতেন। কিন্তু আমাদের কাছে সেগুলো কাহিনীই হতো যদিও সেগুলো ছিল সত্য ঘটনা। আলিফ লায়লায় হাসেদ ও মাহসুদের একটি কাহিনী অন্তর্ভুক্ত আছে, তাও তিনি শোনাতেন। সেটি সত্য হোক বা মিথ্যা যাইহোক না কেন তাতে

এক শিক্ষণীয় দিক ছিল। অনুরূপভাবে আমরা অনেক প্রবাদ তাঁর কাছে শুনেছি যা কাহিনীর সাথে সম্পর্ক রাখে। অতএব শৈশবে শিক্ষার উত্তম উপায় হলো, গল্প শোনানো। যদিও কোন কোন গল্প অর্থহীন এবং বাজে হয়ে থাকে কিন্তু কল্যাণকর এবং চারিত্রিক শক্তিকে দৃঢ় করার এবং শিক্ষণীয় কাহিনীও গল্পও রয়েছে। যখন সন্তান- সন্ততির বয়স খুবই কম থাকে তখন এভাবেই তাদের শিখানো হয়। এরপর কিছুটা বড় হলে শিক্ষা এবং তরবীয়তের উৎকৃষ্ট উপায় হলো, খেলাধূলা। অনেক সময় পিতা-মাতারা আমাদের কাছে আসে যে, বাচ্চারা অনেক বেশি খেলাধূলা করে। যদি টেলিভিশনে না খেলে, বাহিরে গিয়ে যদি খেলে থাকে তাহলে তাদের খেলতে দেয়া উচিত। বই-পুস্তকের সাথে যেসব বিষয়ের জ্ঞান দেয়া হয় খেলাধূলার মাধ্যমেও কার্যতঃ তাই শিখানো হয়ে থাকে কিন্তু কাহিনী বা গল্পের যুগ খেলাধূলার পূর্বের যুগ।

অতএব পিতাদের উচিত সন্তানদের সময় দেয়া। পিতা-মাতা উভয়ে সম্মিলিতভাবে যদি সন্তান-সন্ততির তরবীয়তের ওপর জোর দেয়, তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে, তাদের সঠিক তরবীয়ত করে, তাদেরকে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলে তরবীয়তের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা যা নিয়ে সচরাচর পিতা-মাতারা অভিযোগ করে থাকেন। আরেক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, শৈশবে শিশুদের যেসব কাহিনী বা গল্প শোনানো হয় তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে হৈ-চৈ , পিতা-মাতাকে বিরক্ত করা এবং সময় নষ্ট করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। যদি এমন কাহিনী শোনানো হয় যা পরবর্তী জীবনের জন্যও কল্যাণকর তাহলে এটি কতই না ভালো উত্তম। আজকাল বাচ্চারা যেন হৈ-চৈ না করে এবং পৃথক বসে থাকে এই উদ্দেশ্যে পিতা-মাতারা তাদের হাতে হয়ত আইপ্যাড ধরিয়ে দেয় বা কম্পিউটার বা টেলিভিশনের সামনে বসিয়ে দেয় আর তাতে যদি কোন ভালো কাহিনী বা গল্প চলতে থাকে তাহলে ঠিক আছে কিন্তু প্রায় সময় এতে কেবল অযথা সময়ই নষ্ট হয়। ছোট বয়সের শিশুদের তো এমনিতেও এসবের সামনে বসিয়ে রাখা উচিত নয় কেননা; দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে একেতো চোখের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, দ্বিতীয়তঃ ডাক্তারদের কথা অনুযায়ী এতে দু'বছরের কম বয়সের শিশুদের চিন্তাধারাও বদলে যায় আর তারা এরপর এক দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এর অনেক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের যেভাবে কাহিনী শোনাতেন এতে সেই সময় বা সেই বয়সে কাহিনী শোনানোর যে উপকারিতা রয়েছে তাও আমাদের লাভ হতো। তখন তিনি যদি আমাদের এসব গল্প না শোনাতেন তাহলে আমরা হৈ-চৈ করতাম আর তিনি কাজ করতে পারতেন না। তাই আমাদের কাহিনী শুনিয়ে চুপ করানো আবশ্যক ছিল আর এ কারণেই রাতের বেলা আমাদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য তিনি (আ.) যখনই সময় পেতেন আমাদের কাহিনী শোনাতেন যেন আমাদের ঘুমিয়ে পড়ার পর তাঁর কাজের সুযোগ হয়। বাচ্চাদের জানা থাকে না যে, তাদের পিতামাতা কত বড় কাজ করছেন। তাকে আগ্রহের উপকরণ যদি সরবরাহ না করা হয় তাহলে সে হৈ-চৈ করে আর কাহিনী বা গল্প

শোনানোর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাদের ঘুম পাড়ানো। সে যুগে এসব বিষয় ছিল না, পিতা-মাতা পরিশ্রমই করতেন। কিন্তু আজকাল, আমি যেমনটি বলেছি, কিছু এমন জিনিস সামনে এসে গেছে যে কারণে প্রথমতঃ পিতা-মাতা তরবীয়তের পিছনে পরিশ্রম করে না, দ্বিতীয়তঃ সন্তানদের সাথে সম্পর্কের গভীরতা হারিয়ে গেছে। তিনি বলেন, কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা এমন একটি বিষয় যা সবাই স্বীকার করেছে, সেই প্রয়োজন সাময়িকই হোক না কেন। বাচ্চার তখন শুধু এতটা উপকার হয় যে, এর প্রতি বাচ্চার আগ্রহ জন্মায়, সে নিবিড় চিত্তে এটি শোনার পর ঘুমিয়ে পড়ে। পিতা-মাতার উদ্দেশ্য হলো, সময়ের সাশ্রয়। তাই বাচ্চাকে বিছানায় শুয়ে গল্প শোনায় আর একজন গল্প শোনায় এবং দ্বিতীয়জন কাজে লেগে থাকে বা একজন শোনালেও বাকী পরিবারের সবাই নির্বিঘ্নে কাজ করে। এই সময় যদি বাজে এবং অর্থহীন কাহিনী শোনানো হয় তাহলেও এই লক্ষ্য অর্জন হয় কিন্তু আমরা এতে সন্তুষ্ট নই বরং এমন কাহিনী শোনানো উচিত যেন তখনও উপকার হয়।

বন্ধুত্ব সব সময় এমন হওয়া উচিত যা কোনভাবে ধ্বংসের কারণ হবে না, এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এটি একটি পুরোনো কাহিনী। এক ব্যক্তির ভাল্লুকের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, সে সেটিকে পুষে ছিল বা কোন সমস্যার সময় সেটিকে সাহায্য করেছিল তাই সেই ভাল্লুক তার কাছে এসে বসে থাকত। যদিও এটি একটি গল্প, যা সত্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে। যদিও এমনও হয়ে থাকে, মানুষ ভাল্লুক ইত্যাদি পালার পর সেগুলোকে পোষ মানায় কিন্তু আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে যখন কোন গল্প শোনাই তখন তা কেবল একটি কাহিনীই হয়ে থাকে যা সত্য স্পষ্ট করার উদ্দেশ্য শোনানো হয়। আমি এই কথাটি স্পষ্ট করছি এ জন্য যে, শত্রুরা হয়তো এই আপত্তিও করবে, এরা এমন নির্বোধ মানুষ যারা মনে করে, ভাল্লুক মানুষের কাছে এসে বসে। এসব পুরোনো কাহিনী শিখার উদ্দেশ্য বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ হলো, এমন প্রকৃতির মানুষও থেকে থাকে। কতিপয় মানুষ এমন প্রকৃতির অধিকারী যারা এমনই কাজ করে অর্থাৎ পশুর মত, যেমন পুরোনো বিভিন্ন গল্পে বাদশাহ্‌র রাজ দরবারকে সিংহের রাজ দরবার এবং তার রাজন্যবর্গকে অন্যান্য পশু হিসেবে বর্ণনা করা হয়। আর এভাবে সেই বাদশাহ্‌ও অর্থাৎ যার সম্পর্কে কথা হয় সেও বড় মনোযোগ সহকারে তা পড়ে। যাহোক একটি ভাল্লুক সেই ব্যক্তির বন্ধু ছিল এবং তার কাছে আসত। একদিন তার মা অসুস্থ হয়ে পড়লে সে পাশে বসে বাতাস করছিল এবং মাছি তাড়াচ্ছিল। দৈবক্রমে কোন প্রয়োজনে তাকে বাহিরে যেতে হয়। সে ভাল্লুককে বলে, তুমি মাছি তাড়াও, আমি আসছি। ভাল্লুক আন্তরিকভাবে সেই কাজ আরম্ভ করে কিন্তু মানুষ এবং পশুর কাজের মধ্যে পার্থক্য থেকে থাকে। পশু এত সহজে হাত নাড়াতে পারে না যত সহজে মানুষ নাড়াতে পারে, সে মাছি তাড়ায় কিন্তু মাছি আবার এসে বসে পড়ে, সে আবার তাড়ায় আবার এসে বসে, সে ভাবলো, মাছির এভাবে বারবার এসে বসা আমার বন্ধুর মায়ের জন্য বড়ই কষ্টকর প্রমাণিত হচ্ছে, এর সমাধান হিসেবে সে একটা বড় পাথর উঠিয়ে ছুড়ে মারে যেন মাছি মারা যায়।

মাছি তো মরে যায় কিন্তুএকই সাথে তার মাও পিষ্ট হয়। এটি নিছক একটি উদাহরণ, এর অর্থ হলো, অনেক নির্বোধ কারও সাথে বন্ধুত্ব করে, কিন্তু বন্ধুত্বের রীতি জানে না। অনেক সময় বন্ধু মানুষের হিতাকাঙ্খী হলেও তা ধ্বংস ডেকে আনার কারণ হয়। যদি বন্ধু সত্যিকার অর্থে কল্যাণকামী হয় তাহলে সে কখনও ঈমানহীনতার দিকে নিয়ে যেতে পারে না বরং সেদিকে আকৃষ্ট দেখলে বন্ধুকে বাধা । মহানবী (সা.) বন্ধুত্বের কত অনুপম চিত্র অঙ্কন করেছেন দেখুন! তিনি বলেন, নিজ ভাইয়ের সাহায্য কর, সে যালেম হোক বা মযলুম অর্থাৎ অত্যচারী হোক বা অত্যচারিত, বন্ধুকে সাহায্য কর। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এর অর্থ কি, আমরা কি অত্যাচারীকেও সাহায্য করব? তিনি বলেন, সত্যিকার অর্থে অত্যাচারীর হাতকে অত্যাচার থেকে বিরত রেখে তুমি তাকে সাহায্য কর। এমন নয় যে, বন্ধুকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করবে বা তার ইচ্ছার দাসত্ব করবে বরং আসল বন্ধুত্ব হলো, বন্ধুর কল্যাণার্থে তার বিরুদ্ধেও যদি যেতে হয় যাও, এমনটি যদি না কর তাহলে তাকে ধ্বংস করছ বা তার ক্ষতি করছ । অধিকাংশ মানুষ এই বিষয়টি বুঝে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কাদিয়ানের দৃষ্টান্ত এটি। এক ব্যক্তির আরেকজনের সাথে ঝগড়া হয়, এমন সময় তার এক বন্ধু চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অন্যায়ভাবে বন্ধুত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য বা বন্ধুত্বের দাবির নামে সেই ঝগড়ায় অংশ নেয়। প্রথমজন তার সহজাত পুণ্যের কারণে নিজের জায়গায় ফিরে আসে, এই ঝগড়া বিবাদের অবসান হয় কিন্তু সেই বন্ধু যে তার খাতিরে এই ঝগড়ায় অংশ নিয়েছিল সে মুরতাদ হয়ে যায়। অতএব বন্ধুত্ব যেখানে খোদার নৈকট্যের কারণ হয়ে থাকে, বন্ধুর কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে, সেখানে অনেক সময় নিজের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে আর বন্ধুদেরও ধ্বংস ডেকে আনে। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ধুত্বের দাবি রক্ষার জন্য কাণ্ড-জ্ঞানও খাটানো উচিত আর আবেগ অনুভূতিকেও নিয়ন্ত্রণ করা চাই।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শোনাতেন, একটি ভাল্লুক ছিল। এক ব্যক্তির সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল, তার স্ত্রী সব সময় তাকে এই বলে খোঁচা দিত, তুই আবার কেমন মানুষ যে, ভাল্লুকের সাথে তোর বন্ধুত্ব! এক দিন তার মর্মপীড়াদায়ক কথাবার্তা এতটাই সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং এত উচ্চস্বরে সে কথা বলতে আরম্ভ করে যে, ভাল্লুকও তা শুনে ফেলে। ভাল্লুক তখন একটি তরবারি হাতে নেয় এবং তার বন্ধুকে বলে, এই তরবারি দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করো। এই কাহিনী শুনে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, এটি কেবল একটি কাহিনী। উদ্দেশ্য হলো একথা বুঝানো যে, কিছু মানুষের চেহারা ভাল্লুকের মত হয়ে থাকে কতকের মাঝে মানবতা থাকে, সবার প্রকৃতি পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। অনেকে ভাল্লুক প্রকৃতির হয়ে থাকে, অনেকে মানুষ আখ্যায়িত হলেও সত্যিকার অর্থে পশু হয়ে থাকে। সেই ব্যক্তি এড়িয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করে কিন্তু সে বলে, আমার মাথায় মারতেই হবে, অবশেষে তরবারি

নিয়ে সে ভাল্লুকের মাথায় আঘাত করে। সে রক্তরঞ্জিত হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। এক বছর পর আবার বন্ধুর কাছে আসে এবং বলে, আমার মাথা দেখ! কোথাও আঘাতের চিহ্ন আছে কি? সে দেখে যে, আঘাতের কোন নাম গন্ধও ছিল না। তখন সেই ভাল্লুক বললো, জঙ্গলে বিভিন্ন বনজ গাছপালা রয়েছে, আমি চিকিৎসা করেছি যার ফলে ক্ষত ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু তোমার স্ত্রীর মর্মপীড়াদায়ক কথা-বার্তা যা আমার বিরুদ্ধে সে বলতো তার ক্ষত আজও অম্লান। অনেক সময় মুখের জখম তরবারীর জখম থেকেও ভয়াবহ হয়ে থাকে আর এই তরবারী অর্থাৎ জিহ্বা এমনভাবে আঘাত হানে যে, মানুষ তা ভুলতে পারে না।

তাই সামাজিক শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য, পরস্পরের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার প্রতিও সবার দৃষ্টি থাকা উচিত আর অনর্থক কথার এমন তীর ছোড়া উচিত নয় যার ক্ষত কখনো সারে না। সব আহমদীকে সর্বদা এ কথাটি স্মরণ রাখা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার পর বা তাঁকে মানার পর প্রত্যেক আহমদীর উচিত নিজের ঈমানের সুরক্ষা করা। অনেক সময় তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় ঈমানকে ধ্বংস করে, যেমনটি আমি বলেছি, এক ব্যক্তি বন্ধুকে সাহায্য করার নামে পরে নিজের ঈমান হারিয়ে বসে এবং মুরতাদ হয়ে যায়। অনেক সময় খোদার ইচ্ছা-পরিপন্থি কথা বললে ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়। তাই সব সময় আমাদের আত্মজিজ্ঞাসায় লেগে থাকা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন যে, হযরত মূসার কাহিনীতে এর দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এই কাহিনী বারবার শোনাতেন। বলা হয়, হযরত মূসা (আ.) যখন মিশর থেকে বের হন, পথিমধ্যে তিনি আমালিকদের মুখোমুখী হন। এটি হযরত নূহের সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকে একটি গোত্র ছিল যারা ইসরাঈলীদের ঘোর বিরোধী ছিল। যাহোক তাদের বাদশাহ্‌র আশঙ্কা হয় যে, আমরা পরাজিত হব। সে দেশে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি বসবাস করতেন। বাদশাহ্ তার কাছে দোয়ার অনুরোধ করেন। সেই বুযূর্গ দোয়া করেন, তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহাম হয়, মূসা আল্লাহ্ তা'লার নবী, তাঁর বিরুদ্ধে দোয়া করা উচিত নয়। সেই পুণ্যবান ব্যক্তি বাদশাহ্‌কে বলেন, মূসার বিরুদ্ধে দোয়া করা সম্ভব নয়। বাদশাহ্ যখন জানতে পারলো যে, তার কোন কথা কোন কাজে আসছে না তখন সে সেই চক্রান্তই করেছে যা আদমকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করার জন্য শয়তান করেছিল, সব সময় শয়তানের এই রীতিই চলে আসছে, হাওয়ার মাধ্যমে প্রথমবার বিভ্রান্ত করেছিল। সেও মূসার বিরুদ্ধে দোয়া করানোর জন্য সেই পুণ্যবান ব্যক্তির স্ত্রীকে অনেক গহনা-অলঙ্কার বানিয়ে দেয়। সেই স্ত্রী স্বামীকে দোয়ার জন্য বলে। তিনি বলেন, মূসা খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত নবী, তাঁর বিরুদ্ধে অভিসম্পাত করা সম্ভব নয়, আমি দোয়া করেছিলাম কিন্তু সেখান থেকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উত্তর এসে গেছে। কিন্তু তার স্ত্রী জোর দিতে থাকে, অবস্থা একই থাকা তো আবশ্যক নয় তুমি অভিসম্পাত কর, অবশেষে সেই বুযূর্গ সম্মত হয়। তারা তাকে এক জায়গায় নিয়ে যায়, তিনি বলেন, এখানে আমার মন থেকে

অভিশাপ বের হচ্ছে না; এভাবে দু' তিনটি স্থান পরিবর্তন করা হয়। তার ঈমান যেহেতু নষ্ট হওয়ার ছিল, তাই সে অভিশাপ করে বা অভিশাপ দেয়। বলা হয়, অভিশাপ দিতেই মূসার জাতিতে ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসে কেননা; তার পূর্বের ঈমানের কিছু না কিছু প্রভাব তো ছিলই আর মূসার জাতিতে ঈমানের যে দুর্বলতা ছিল সেই দুর্বলতার কারণে তারা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর অপর দিকে বুযূর্গের ঈমান কবুতরের মত উড়ে যায়। তার ঈমানও নষ্ট হয় কেননা; আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন দোয়া করবে না কিন্তু সে অভিসম্পাত দিয়েছে, এর শাস্তি স্বরূপ মূসার বিরুদ্ধে দোয়ার ফলে তার বুযূর্গ হিসেবে যে মর্যাদা ছিল তাও হারিয়ে যায় আর খোদার দরবারে যে নৈকট্য ছিল তাও হারিয়ে যায়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সন্দেহ নেই যে এটি একটি কাহিনীমাত্র কিন্তু এর অর্থ হলো, যেভাবে কবুতর হাত থেকে উড়ে যায় অনুরূপভাবে ঈমানও সেই ব্যক্তির হৃদয় থেকে বেরিয়ে যায়। ঈমান অনেক পরিশ্রমের পর লাভ হয় আর একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায়। ঈমান আনা বা কোন কিছু গ্রহণ করা আর এরপর ঈমানে উন্নতি করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু একটা সামান্য কথা যা একটি বাক্যের সমান হয়ে থাকে যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার পরিপন্থী হয়ে থাকে, তার মাধ্যমেই ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তাই মানুষের উচিত সব সময় সাবধান থাকা এবং আত্মজিজ্ঞাসায় লেগে থাকা।

যিকরে ইলাহী বা খোদার স্মরণের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কোন পুণ্যবান ব্যক্তির এই কথা শোনাতেন যে, **'দস্ত দরকার দিল বা ইয়ার'** অর্থাৎ মানুষের হাত কাজে রত থাকা উচিত কিন্তু তার হৃদয় লেগে থাকা উচিত খোদার স্মরণে। অনুরূপভাবে একজন পুণ্যবান মানুষ সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে, কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে, আমি কতবার আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করবো। তিনি বলেন, প্রেমাস্পদের নাম গুণে গুণে নেয়া কীভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে? আসল যিকর সেটি যা অগণিত হয়ে থাকে কিন্তু একটি সময় নির্ধারণ করার উপকারী দিক হলো, মানুষ তখন অন্য কাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে প্রেমাস্পদকে স্মরণ করবে। এই উভয় অবস্থা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক তাই সঠিক রীতি হলো, নির্দিষ্ট সংখ্যায় আর নির্দিষ্ট ভাবেও যিকরে ইলাহী করা উচিত। আজকাল বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত মানুষ এ কথাটি বুঝে না, তাই অবশ্যই তাদের সময় বের করা উচিত। আর অনির্দিষ্টভাবেও চলাফেরায়, উঠা-বসার ক্ষেত্রে সময় করে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা উচিত। তাঁর অনুগ্রহ এবং কৃপারাজির কথা বার বার উল্লেখ করা উচিত।

ধর্মীয় কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শোনা, সেগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করা আর সে অনুসারে কাজ করা একজন আহমদীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। খুতবা শোনা বা বক্তৃতা শোনা বা কোন অধিবেশনে বা বৈঠকে অংশগ্রহণ বা সাময়িকভাবে কোন পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করা,

সাময়িক প্রভাব গ্রহণ করা মাত্র। সেটিকে স্মরণ না রাখা বা সে অনুসারে কাজে পরিবর্তন না আনা মানুষের কোন কাজে আসে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার মহিলাদের মাঝে তাদের তরবীয়তের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান আরম্ভ করেন এবং অনবরত বেশ কয়েক দিন বক্তৃতা দেন। একদিন তিনি বলেন, মহিলাদের পরীক্ষাও নেয়া উচিত, যেন বুঝা যায়, তারা আমাদের কথা কতটা তারা বুঝে উঠতে পারছে। বাহির থেকে একজন মহিলা এসেছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, আট দিন হয়ে গেছে বক্তৃতা করছি, এসব বক্তৃতায় আমি কি বর্ণনা করেছি তা আমাকে একটু বল। সেই মহিলা বলেন, আল্লাহ্ এবং রসূলের কথাই আপনি বলে থাকবেন বা বর্ণনা করেছেন এছাড়া আর কী বলেছেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই উত্তর শুনে এতটাই দুঃখ ভারাক্রান্ত হন যে, তিনি বক্তৃতা প্রদান করা বন্ধ করে দেন এবং বলেন, আমাদের মহিলাদের মাঝে এমন ঔদাসীন্য বিরাজমান যে, মনে হয় যেন এখনও তারা অতি প্রারম্ভিক শিক্ষারই মুখাপেক্ষী। উন্নত পর্যায়ের আধ্যাত্মিক কথা বোঝার সামর্থই তাদের নেই।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কোন কোন পুরুষের অবস্থাও এমনই বরং আমি তো বলবো, অনেক পুরুষের অবস্থাই এমন। কোন কোন স্থানে এর বিপরীত চিত্রও দেখা যায়, মহিলারা পুরুষের চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন আর তারা যখন স্বামীদের স্মরণ করান যে, এই হলো ধর্মের কথা, এটি মেনে চল, অনেক সময় অভিযোগ আসে, স্বামীরা তখন উত্তর দেয়, ধর্ম তো অনেক কিছু বলে, আমরা এভাবেই থাকবো আর সেভাবেই করব যেভাবে ইচ্ছা হয়। স্মরণ রাখা উচিত, এমন ধৃষ্টতা যখন মাথায় বা হৃদয়ে ভর করে নেয় তখন অধঃপতন দেখা দেয়, মানুষ ধর্ম থেকে অনেক দূরে ছিটকে পরে। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, পক্ষান্তরে সাহাবীদের দেখ! কীভাবে দিবারাত্র তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথা শুনতেন এবং তা কর্মে রূপায়িত করার জন্য সোচ্চার থাকতেন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বা যত বড় কথাই হোক না কেন সেগুলো গ্রহণ করে তাঁরা তা পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন আর এর ওপর আমল করেও দেখিয়েছেন। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক-পুস্তিকা পড়া এবং সেগুলো থেকে লাভবান হওয়াও জামাতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বাবলীর অন্তর্গত। কিন্তু স্মরণ রেখো! শুধু উপভোগের উদ্দেশ্যে এমনটি করো না বরং তা থেকে উপকৃত হওয়া এবং আমল বা কর্মে রূপায়িত করার জন্য এদিকে মনোযোগ দাও। তোমরা যদি উপভোগের উদ্দেশ্যে সারা কুরআনও পড় তাতে কোন লাভ হবে না কিন্তু যদি খোদার গুণাবলী সম্পর্কে প্রণিধান করে তাঁর ভালোবাসার প্রেরণায় একবারও যদি সুবহানাল্লাহ্ বল তাহলে তা-ই তোমাকে অনেক ওপরে নিয়ে যাবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার মজলিসে বা বৈঠকে বলেন, অনেক সময় আমরা তসবীহ্ করি, একবার সুবহানাল্লাহ্ বলেই আমরা অনেক ওপরে পৌঁছে যাই। আমি সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম না, একজন যুবক এই কথা শুনে সেখান থেকে আমার কাছে আসে এবং বলে,

জানি না আজকে হুযূর কি বলেছেন এই বাক্যের মাধ্যমে? তার অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু আমি বয়সের সেই অংশেও অভিজ্ঞতা রাখতাম, অথচ আমার বয়স তখন মাত্র ১৭ বা ১৮ বছর হবে। তার কথা শুনে আমি বললাম, হ্যাঁ, এমনটি হয়। সে বললো, কীভাবে? আমি বললাম, বেশ কয়েক বার আমি দেখেছি, আমি শুধু একবারই সুবহানাল্লাহ্ বলেছি, আর আমার এমন মনে হয়েছে যে, এরফলে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আমার অনেক উন্নতি লাভ হয়েছে। হৃদয় থেকে উদ্ভূত সুবহানাল্লাহ্ ছিল সেটি, শুধু বুলিসর্বস্ব নয়। একথা শুনেই সে তাচ্ছিল্যভরে বলে বসে, **লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্**। এর কারণ হলো, সে কখনও আন্তরিকতার সাথে সুবহানাল্লাহ্‌র বিষয় নিয়ে চিন্তাই করেনি। সারা দিন সুবহানাল্লাহ্ বলে সে কিছুই পেত না কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি জানতাম, অনেকবার এমন হয়েছে, আমি যখন সুবহানাল্লাহ্ বলি তখন আমার এমন মনে হয়েছে যে, আমি পূর্বে ভিন্ন কিছু ছিলাম আর এখন ভিন্ন কিছু হয়ে গেছি।

দেখ মহানবী (সা.)-ও এই বিষয়টি কত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন অথচ আমি তখন পর্যন্ত বুখারী শরীফ পড়িনি কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা সঠিক ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, **"কালেমাতানে হাবীবাতানে ইলার রহমান"** অর্থাৎ দু'টো শব্দ এমন আছে যা দয়ালু খোদার দৃষ্টিতে খুবই প্রিয়, **"খাফিফাতানে আলাল লিসান"** তা উচ্চারণ করা খুবই সহজ। মানুষ খুব সহজেই এই শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারে আর অনায়াসেই উচ্চারণ করতে পারে, **"সাকিলাতানে ফিল মিজান"** কিন্তু কিয়ামত দিবসে যখন কর্মের ওজন করা হবে তখন পাল্লায় তা অনেক ভারী প্রমাণিত হবে আর যে পাল্লায় এ দু'টো বাক্য থাকবে সেই পাল্লা সম্পূর্ণভাবে এক দিকে ঝুঁকে যাবে। সেই শব্দ দু'টো হলো **"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহীল আযীম"**। তিনি বলেন, আমার এই শব্দগুলো পাঠের সুগভীর অভ্যাস রয়েছে আর আমি দেখেছি অনেক সময় এই শব্দগুলো একবার উচ্চারণ করলেই আমার আত্মা ঊর্ধ্বালোকে উড্ডীন হয়। আসল কথা হলো, আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা এবং প্রণিধান করা এবং সেগুলোকে কর্মে রূপায়িত করার চেষ্টা করা। এটিই সত্য কথা, অনেক সময় হৃদয়ের গভীর থেকে যখন আল্লাহ্ তা'লার তসবীহ্ করা হয়, আল্লাহ্‌র প্রশংসার গান গাওয়া হয় তখন এমন মনে হয় যেন অন্তরাত্মায় এর সুগভীর প্রভাব পড়ছে ।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন। এই তসবীহ্ যেখানে আমাদেরকে কর্মশক্তিতে বলীয়ান করবে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হবে সেখানে আমরা যেন এমনভাবে তসবীহ্ এবং তাহমীদ করি অর্থাৎ যেন এমনভাবে খোদার পবিত্রতার গান গাইতে পারি এবং এমনভাবে খোদার প্রশংসার গান গাইতে পারি যা আমাদের আত্মায় আধ্যাত্মিক আকাশে উড্ডয়নের শক্তি যোগাবে এবং আমরা খোদার নৈকট্য লাভ করবো।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।